ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 616-623
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.050

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্পে চিত্রভাবনা

আদেশ লেট, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস, উত্তর প্রদেশ, ভারত*

Received: 12.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Jyotirindra Nandi (20 August 1912 - 3 August 1982) is recognized as one of the finest fiction writers in 20th-century Bengali literature. His works often delve into the complexities of family relationships and the psychological nuances of both male and female characters. While many writers employ diverse techniques to publish their works, Nandi's approach is uniquely distinctive. One of his most striking stylistic devices is the use of vivid imagery. In nearly all of his stories and novels, he skilfully crafts pictures using by words to bring his narrative to life and evoke a strong emotional response in the reader.

As revealed in the introduction to Jyotirindra Nandir Nirbachita Galpo, edited by Dr. Nitai Bosu, Nandi had a lifelong fascination with visual art. From a young age, he enjoyed painting alongside his paternal uncle, indicating an early artistic inclination. Inspired by the historical novels of Rameshchandra Dutt and the literary works of Rabindranath Tagore, Nandi began to explore the potential of imagery in fiction. This fusion of artistic sensibilities resulted in a distinctive literary voice, blending the depth of a gifted storyteller with the keen visual perception of a painter.

By analyzing stories such as Nadi o Nari, Samudro, Brishtir Pore, Girgiti, Shwapad, Mangalgraho, Parvatipurer Bikel, and Jwala, we can observe how Jyotirindra Nandi masterfully integrates imagery into his narratives, enriching them with layers of visual and emotional depth.

Keywords: Imagery, Visual representation, light and shadow, Portraiture, Pomegranate tree, Illusion

আমরা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখব যে একেবারে প্রথম জীবনে তিনি চিত্রশিল্পের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তখন তিনি লেখার চেয়ে বেশি ছবি আঁকায় মগ্ন ছিলেন। তাঁর আর্টিস্ট জীবনের সঙ্গী ছিলেন তাঁর ছোটোমামা। তারপর যখন তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত-র 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'মাধবীকঙ্কন' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' এই তিনটি উপন্যাস হাতের কাছে পেয়েছিলেন, তখন উপন্যাসে বর্ণিত পাহাড়, ঝর্না ইত্যাদি প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্য তাঁর মনে চিত্র হয়ে ধরা দিয়েছিল। তারপর

রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' হাতে পাওয়ার পর তিনি অভিভূত হন এবং গল্প লেখার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তখন তিনি রং-তুলি নিয়ে ছবি আঁকা থেকে কিছুটা সরে এসে গল্পের মধ্য দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন এবং সুনিপুণ ছবির ব্যবহার করে তিনি তাঁর গল্পগুলিকে অনবদ্য করে তোলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ছবির সন্ধান পেয়ে থাকি। যেমন— নিসর্গ প্রকৃতির ছবি, প্রতিকৃতির ছবি, বিমূর্ত ছবি, ইত্যাদি। আবার এরই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'আলো-ছায়া' (Light and Shade)-র সুনিপুণ উপস্থাপনা এবং বিশেষ বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত(Focus on) করার প্রবণতা। আলোচ্য প্রবন্ধে আনুপুঙ্খিক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

প্রথমেই আসা যাক গল্পকার তাঁর গল্পে নিসর্গপ্রকৃতির চিত্রকে কীভাবে উপস্থাপন করেছেন সেই প্রসঙ্গে। মনে রাখতে হবে একজন গল্পকার তাঁর গল্পে অযথা কোনো ছবিকে টেনে আনেন না। গল্পের আবহ সৃষ্টি, পরিবেশ নির্মাণ এবং গল্পের মেজাজকে স্পষ্ট করতেই তিনি ছবি সৃষ্টি করেন। 'নদী ও নারী' গল্পে যে প্রকৃতি-চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পটির নামকরণে গল্পকার যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন, সেই ব্যঞ্জনাকে ধরে রাখতেই বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে প্রকৃতিকে বার বার টেনে এনেছেন। গল্পের প্রথম অংশটি লক্ষণীয়— 'সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় নদীর পাড় ধরে মাঠের পর মাঠ। পরিষ্কার স্বচ্ছ শস্পতটের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ গঞ্জে যাবার। এখানে ওখানে দুটি নারকেল গাছ। চারিদিক নিঃঝুম।'[১] বর্ণনাটি পড়ে আমরা সহজেই বুঝতে পারি এটি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। আবার গল্প পড়ে এও জানা যায় যে এই অংশে নৌকায় এক নবদম্পত্তি অর্থাৎ সুরপতি ও নির্মলা উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু তবুও এই দৃশ্যকে রোমান্টিক মনে হয় না। কেননা, এখানে গল্পকারের উদ্দেশ্য রোমান্টিকতা নয়। তিনি গল্পের আবহ নির্মাণ করতেই এই নির্জন পরিবেশের ছবি এঁকেছেন। ছবিটির দিকে লক্ষ রাখলে দেখবো যে, 'নদীর পাড় ধরে মাঠের পর মাঠ', 'এখানে ওখানে দুটি একটি নারকেল গাছ' এই উপাদানগুলি তিনি খুব সচেতন ভাবেই ব্যবহার করেছেন এক বিচ্ছিন্নতা বা নির্জনতাকে স্পষ্ট করতে। তাই তিনি বলেছেন 'চারিদিক নিঃঝুম', শুধু তাই নয়, 'নির্মলার শাড়ির খসখস শব্দ ও হাতের চুড়ির আওয়াজ টের পেয়ে একটা মাছরাঙা 'ক্রিক' শব্দ করে উড়ে গেল'[২] এই কথাটির মধ্য দিয়ে তিনি নির্জনতাকে অনেকটাই বাড়িয়ে তুলেছেন। পরিবেশ কতটা শুনশান হলে 'শাড়ির খসখস ও চুড়ির আওয়াজ'-এ একটা মাছরাঙা পাখি 'ক্রিক' শব্দ করে উড়ে যেতে পারে তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু গল্পকার কেন এরকম পরিবেশের ছবি গ্রহণ করেছেন তা গল্পের বিষয়বস্তু অর্থাৎ একজন নারীর নদীকেন্দ্রিক এক অদ্ভুত জীবনসংগ্রাম এর দিকে লক্ষ রাখলে আমরা বুঝতে পারবো।

গল্পের বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করতে গল্পকার আরও একটি ছবির ব্যবহার করেছেন। আগের ছবিতে আমরা দেখেছি গল্পকার কোনো রং-এর কথা উল্লেখ করেননি, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখবো যে তিনি অসাধারণ রং-এর ব্যবহার করেছেন। 'আকাশ ও পদ্মার প্রসারিত বক্ষ ছেয়ে নেমে এল দিনাবসানের নির্মল অবসাদ। পরপারে ধূসর বালির বিছানায় আঁকাবাঁকা জলের রেখা অস্তসূর্যের আভা লেগে সোনা হয়ে উঠেছে।'[৩] এই অংশে আমরা প্রত্যক্ষ করি গোধূলিবেলার এক দৃশ্য। তবে গল্পকার অন্যান্য গোধূলিবেলার মতো এই গোধূলিবেলাকে অতটা মনোরমভাবে আঁকেননি। দূরের সাদা বোট দেখে গল্পের চরিত্র নির্মলা ও সুরপতির মনে যে জিজ্ঞাসাবোধ এবং বোটের উপরে থাকা নারীর আচরণে বিস্ময়বোধ ও রহস্যময়তা জেগে ওঠে তা পদ্মা নদীর রহস্যময়তার সঙ্গে এক হয়ে উঠেছে। 'নির্মল অবসাদ' কথাটি এপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়। আবার দেখা

যাচ্ছে গল্পে এই ছবিটি অনেকটাই বিশ্রামসূচক(Interval) হয়ে উঠেছে। আসলে গল্পকার একাধিক প্রশ্নকে সামনে রেখে এই ছবির মাধ্যমে গল্পের যে বিরতি সৃষ্টি করেছেন এবং গল্পের রহস্য উন্মোচনের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন। গল্পকারের এই কৌশলটি ছবিটিকে অন্য মাত্রা দান করেছে।

'পার্বতীপুরের বিকেল' গল্পে রয়েছে শহীদ সন্তানের শোকাতুর পিতার মর্মবেদনা। গল্পটি শুরু হয়েছে যে বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা ক্রমশ এক ছবি। বর্ণনাটি এরকম —'বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই ঘাস ভিজে ছিল। একটা মাঠের মতো জায়গায় আমরা এসে গেলাম। সুন্দর মাঠ। উজ্জ্বল সবুজ গালিচা বিছিয়ে রেখেছে কেউ, মনে হচ্ছিল। আর মাঠের মাঝামাঝি একটা জায়গায় চার-পাঁচটা বাবলা গাছ দাঁড়িয়ে আছে চোখে পড়ল।'[৪] এখানে গল্পকার নিসর্গ প্রকৃতির ছবিটিকে সুন্দরভাবে এঁকেছেন। কিন্তু যে গল্প জুড়ে শহীদ সন্তানের পিতার শোক জমে রয়েছে সে গল্পে গল্পকার শুধু নির্মল পরিবেশের ছবি আঁকলেন একথা ভাবতে খটকা লাগে। আমরা জানি যে, শিল্পীর হাতে প্রথমে ছবি সৃষ্টি হয়, ভাব তৈরি হয় তার পরে। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'চিত্রকথা' গ্রন্থে এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন — '...ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে দরকার তার দেহরূপ, যা দেয় ভাবকে ভঙ্গি এবং সেই ভঙ্গিকেই অনুসরণ বা আশ্রয় করে আমরা পুনরায় উত্তীর্ণ হই ভাবের জগতে।'[৫] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও এখানে প্রথমে ছবির দেহরূপ গঠন করে পরে তার ওপর ভাব আরোপ করেছেন। 'যেমন সবুজ নীচের ঘাসের রঙ তেমন আবার মিশমিশে কালো বাবলা গাছের কান্ডগুলি।'[৬] এই অংশে 'সবুজ' এবং 'কালো' রং-এর ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা জানি 'সবুজ' যেমন শুভ বা সৃষ্টিকে চিহ্নিত করে অন্যদিকে 'কালো' চিহ্নিত করে অশুভ বা ধ্বংসকে। তাই গল্পকার সবুজ ও কালো রঙের বৈপরীত্য সৃষ্টি করে এক রহস্যময় আবহকে পরিবেশন করতে চেয়েছেন। এর পরই আবার তিনি যোগ করেছেন চিত্রকল্পকে — 'যেন মনে হচ্ছিল চার-পাঁচটা কালো রঙের মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে মাঠটাকে পাহারা দিচ্ছে।'[৭] বলা বাহুল্য, এই ছবি যেমন গল্পের পরিবেশকে স্পষ্ট করেছে তেমন পাঠকের জানার আকাঙ্ক্ষাকেও অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছে।

এছাড়াও 'শ্বাপদ' গল্পে শহরের ছেলে খোকনের দৃষ্টিতে গল্পকার এক রোমান্টিক পরিবেশের ছবি এঁকেছেন এভাবে— '...এখন শরৎকাল। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। নারিকেল পাতার ঝালর থেকে উজ্জ্বল রৌদ্র চুইয়ে পড়ছে। নীচে দীঘির জল আয়নার মত স্বচ্ছ স্থির। আয়নার বুকে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছবি, সাদা মেঘের টুকরো টুকরো প্রতিবিম্ব। আর জলের কিনারে লম্বা সবুজ ঘাস, ঘাসের ডগায় হলদে ফড়িং।'[৮] এভাবেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর বিভিন্ন গল্পে নিসর্গ প্রকৃতির ছবিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পে প্রতিকৃতি(Portrait)-র খুব ভালো ব্যবহার দেখিয়েছেন। বিভিন্ন গল্পের চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি চরিত্রের চেহারাকেও খুব স্পষ্টভাবে অঙ্কন করেছেন। 'বৃষ্টির পরে' গল্পে আমরা দেখতে পেয়েছি সন্তানদের অন্যায় আচরণের জন্য মুখোমুখি বসে থাকা অনুশোচনাবোধে ব্যথিত দুই পিতার প্রতিচ্ছবি। এখানে এক পিতা প্রভাত অন্য পিতা হলেন কথক। গল্পকার প্রথমে প্রভাতের চিত্রটিকে নিখুঁতভাবে এঁকে তার ক্রোধ, চিন্তা, ঘৃণা সবকিছুকে একসঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার কথকের ভাবনায় যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দৃশ্য ফুটে ওঠে তার সঙ্গে প্রভাতের বর্তমান অবস্থাকেও সংযুক্ত করতে চেয়েছেন। আলোচনার সুবিধার্থে গল্পে উল্লিখিত সেই অংশগুলি উল্লেখ করা হল—

'প্রভাতের বজ্রমুষ্টি আমার দিকে এগিয়ে এল। কুঞ্চিত কপাল। ভুরুর রেখায় স্পন্দন।'[৯.১]

'বজ্রমুষ্টি আমার নাক কপাল লক্ষ করে ছুঁতে এল না। বরং আস্তে আস্তে তার শক্ত মুঠিটা খুলে গেল, আঙুলগুলি ছড়িয়ে পড়ল; জলে ভেজা পেট-মোটা আঙুরের রঙের নরম ফোলা ফোলা আঙুলগুলি ছড়িয়ে পড়ল।'[৯.২]

'পাতলা ধোঁয়ার বলয় তার প্রকাণ্ড মুখমন্ডল ঘিরে ফেলেছে। চোখ বোজা।'[৯.৩]

'...সেই মুহূর্তে লক্ষ করলাম তার মুখের দাড়ি-গোঁফ অবিশ্বাস্যরকম বেড়ে উঠেছে। বোজা চোখের কোলে গাঢ় কালির পোছ।'[৯.৪]

'... ঠোঁট জোড়া কাঁপছিল। চাউনিটাও কটমটে।'[৯.৫]

'বিশ্রী একটা ভাঁজ দেখা গেল প্রভাতের চর্বি থলো-থলো থুতনিতে।'[৯.৬]

এভাবে খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পকার প্রভাতের ভাব(Expression)-কে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে গল্পকার সাহায্য নিয়েছেন ভাঙা আয়নার— 'ফাটল ধরা আরশির বুকে তাঁর বাঁকাচোরা মুখটিকে শয়তানের মুখের মতন দেখায়। অথচ এমনি সে সুপুরুষ।'[১০] এই অংশটি লক্ষণীয়। গল্পকার এগুলি একসঙ্গে বর্ণনা করেননি, কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনাগুলিকে রেখেছেন। কারণ তিনি গল্পের বিষয় অনুযায়ী প্রভাতের এই ভাবকে পুরো গল্প জুড়ে ছড়িয়ে রাখাটিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। তাই সব বর্ণনাকে একজায়গায় করে দেখা যাচ্ছে সার্বিকভাবে প্রভাতের ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক ছবিটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গল্পকার নিজেও লিখেছেন — 'উত্তেজনা কৌতূহল ঘৃণা লোভ আশঙ্কা আকাঙ্ক্ষার ছবি যদি কেউ একসঙ্গে দেখতে চায় তো প্রভাতকে দেখুক।'[১১] অন্যদিকে কথকের ভাবটিও লক্ষণীয়। গল্প পড়লে বোঝা যায় সে রাগান্বিত নয়। কিন্তু কেউ যতই শান্ত অবস্থায় থাকুক না কেন তার দুর্বল জায়গায় আঘাত করলে সে চুপ থাকতে পারে না, সে আঘাত মানসিক হোক বা শারীরিক। এক্ষেত্রেও আমরা দেখি প্রভাত যখন কথকের পূর্বের মদ্যপানের প্রসঙ্গ অনুসরণ করে বলে— 'কেবল চা খেলে তো আর নেশা হয় না ব্রাদার।'[১২] তখন কথকের রাগান্বিত ভাবটি ফুটে উঠেছে এভাবে— 'এই প্রথম আমার পাকা ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল, হাতের মুঠি শক্ত হল, চোখের রং লাল হল।'[১৩]

'শ্বাপদ' গল্পে গল্পকার দেখিয়েছেন প্রথমদিকে গণেশ একজন গ্রামের সরল ছেলে হলেও, গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় কামাসক্ত হয়ে কীভাবে তার স্বভাব বন্য ও অসামাজিক হয়ে উঠেছে। তবে গল্পকার স্বভাবে তাকে সরল দেখালেও তার যে চেহারার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা থেকেই এই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পকার তার চেহারার বর্ণনা করেছেন শহুরে খোকনের জবানিতে; এভাবে— '...শুকনো পেঁয়াজের শিকড়ের মত চার পাঁচটা অসমান দাড়ি থুতনি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, মাথার চুলগুলি খাড়া খাড়া, নখগুলি বড়বড়; রং চটা ছোট একটা হাফ প্যান্ট পরনে-যা তার বয়স ও দেহের কাঠামোর পক্ষে অত্যন্ত বেমানান ঠেকছিল; মুগুরের মাথার মতন জবরদস্ত হাঁটু দুটোর দিকে তাকিয়ে কথাটা আমার মনে হয়েছিল।'[১৪]

'জ্বালা' গল্পটিতেও দেখা যায় একজন সানওয়ালার ভয়ংকর চেহারার ছবি। গল্পের প্রথমদিকে নীরার কাছে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ ও গরম অসহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই সানওয়ালার বিশ্রী চেহারা নীরার চোখে যে রূপ নেয়, অথবা নীরার দেহে যে জ্বালা ধরায় তা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের জ্বালাকেও উত্তীর্ণ করে। গল্পকার প্রথমে সানওয়ালার কর্মরত অবস্থার ছবি এঁকেছেন নিখুতভাবে। 'যন্ত্রের পাথরের চাকায় ফিতে পরিয়ে লোকটা একটা বাক্স থেকে লাল লাল ইঁটের টুকরো বার করে। টুকরোগুলো চাকার সঙ্গে ঠেকিয়ে দুটো কাঠের মাছখানে ভাল করে বসিয়ে দিয়ে যন্ত্রের পা-দানিতে পা রাখে। একবার পা-দানি চেপে ধরে তখনি

পা-টা তুলে নেয়, আবার চেপে ধরে। কাঠের ফ্রেমের ভিতর বড় চাকা ঘোরে।'[১৫] তারপর আলোকপাত করতে চেয়েছেন সানওয়ালার চেহারাটিকে — 'কপালে এত বড় একটা কাটা দাগ চুল থেকে চোখ পর্যন্ত নেমে এসেছে। কদম ফুলের মতো ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল। কাঁধ দুটো এককালে কেমন উঁচু শক্ত ছিল বোঝা যায়। এখন বসে গেছে। বাঁ কাঁধে আর একটা কাটা দাগ। লোকটা খুনে না ডাকাত! মনে হয় যেন এইমাত্র কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এল। ভেবে সত্যি নীরা চোখ ছোট করে যন্ত্রের ওপর ধরে রাখা কালো কুঁকড়ে যাওয়া শিরাবহুল হাত দুটো পরীক্ষা করে হাতকড়ার দাগ আছে কিনা লক্ষ করে।'[১৬] তারসঙ্গে— 'দন্তহীন নোংরা মাড়ি দুটো মেলে ধরে লোকটা নীরার চোখে চোখ রেখে হাসে।'[১৭] এখানে তার কুৎসিত দৃষ্টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন গল্পকার।

'গিরগিটি' গল্পের ভাব প্রকাশ করতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একাধিক চিত্রের আশ্রয় নিয়েছেন। নরনারীর অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষা থেকে তৃপ্তির সন্ধানকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে উল্লেখিত গল্পটি। নিসর্গ প্রকৃতির ছবি, প্রতিকৃতির ছবি, আলো-ছায়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ছবির সহাবস্থান ঘটেছে এই গল্পটিতে। তবে আমরা সব ছবির আলোচনা এখানে করব না। এখানে মায়ার প্রতিকৃতির ছবিটি গল্পকার কতটা নিপুণভাবে এঁকেছেন আমরা তা দেখে নেব— 'গায়ের জামার বোতাম নেই, আঁচলটা ঢিলে হয়ে মাটিতে লুটোয়, খোঁপায় বাঁধন খুলে দেওয়াতে ঘাড়ে পিঠে কোমর অবধি একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝারি গড়ন। রং খুব ফর্সা না। কিন্তু মুখখানা সুন্দর। অন্তত মায়ার নিজের কাছে নিজের ছোট্ট পাতলা কপাল আর দু'ধারে একটু বেঁকে যাওয়া না-সরু-না-মোটা ভুরু ও ঢালুর দিকে ঈষৎ ছড়িয়ে পড়া নাক ও কালো পালক ঘেরা চোখের লালচে মতন বা বলা যায় বাদামী রঙের চকচকে মণি দুটো অসম্ভব ভাল লাগে। হ্যাঁ, আর ওর কচি পেয়ারার মতন ছোট্ট সুগোল মসৃণ একখানা থুতনি।'[১৮] এভাবেই গল্পকার মায়ার প্রতিকৃতিকে পাঠকের সামনে প্রস্ফুটিত করেছেন। এছাড়াও একটি ডালিম গাছের যৌবন বর্ণনায়, মায়ার যৌবন মিলিয়ে দিতে তিনি এক অসাধারণ চিত্রকল্পের আশ্রয় নিয়েছেন।

পাশ্চাত্যে, সাহিত্যের ভাবধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রতীকিবাদ ও শূন্যবাদ-এর জন্ম হয়, বিমূর্তভাব(Abstract concept) মূলত তা থেকেই এসেছে। বিমূর্তভাব আসলে ভাবমূর্তি। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে গিয়ে কল্পনার মাধ্যমে শিল্পীরা সেই ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেন। বলা চলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও সেই ধরনের একজন শিল্পী। 'সমুদ্র' গল্পটিতে আমার এই বিমূর্তভাবনার পরিচয় পেতে পারি।

গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর 'সমুদ্র' গল্পে তিন ধরনের ছবিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সাধারণের দৃষ্টিতে সমুদ্র তার যে রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে তা এরকম:

> হাঁটু জলে, কোমর জলে, কেউ গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে, আর সাহস পাচ্ছে না এগোতে- ঢেউয়ের ধাক্কায় কাত হয়ে যাচ্ছে, নুয়ে পড়ছে; কেউ কেউ তলিয়ে গিয়ে আবার ভেসে উঠে যেন খাবি খেতে খেতে কোনোরকমে স্নান সেরে ছুটতে ছুটতে তীরে উঠে এল। সাদা টুপি পরা কালো কুচকুচে শরীর নুলিয়ার শক্ত মুঠোর ভিতর আটকা পড়ে সুন্দর মেয়েটা হাঁসফাঁস করছে; বেগোচ্ছল বিশাল ঢেউ হা-হা করে ছুটে আসছে। মেয়ে ভয়ে চোখ বুজল আর সেই মুহূর্তে নুলিয়া ওর বেণীসুদ্ধ ছোট মাথাটা জলের নীচে ঠেসে ধরল। আর্তনাদ করে উঠল কি ও, না ঢেউ সরে গেছে- নুলিয়ার কঠিন বাহুর ওপর ফর্সা নরম শরীরের ভর রেখে ভিজা সপসপে শায়া ব্লাউজ নিয়ে রূপসী মাতালের মতো টলতে টলতে হাসতে হাসতে তীরে উঠে আসছে। কে ওকে মাতাল করল- নুলিয়ার হাতের

> ঝাঁকুনি? ঢেউয়ের একটা মাত্র দোলা? বালির বিছানায় বসে পুরুষ হাসছে। হয়তো স্বামী, হয়তো সঙ্গী। এস্ত হাতে শুকনো শাড়ি ব্লাউজ বাড়িয়ে দিচ্ছে।[১৯]

সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে স্নানার্থীদের এই দৃশ্য অত্যন্ত সাধারণ মনে হয়। কিন্তু কথক সমুদ্রকে দেখেছে অন্যরকমভাবে।

আমরা জানি যে, যারা ভাবুক তারা একান্তে পৃথিবীর সমস্তকিছুকে একটু অন্যরকমভাবে দেখতে চায়। কথকও কিছুটা সেই ধরনের সেকথা বলা চলে। কথক যেভাবে সমুদ্রকে দেখেছে তা মূলত রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি। গল্পকার কথকের দৃষ্টিতে সমুদ্রের যে রূপ তুলে ধরেছেন তা এরকম — 'দেড়ঘন্টা আগে সূর্যোদয় হয়েছে। কিন্তু রোদ ছিল না। জগদ্দল পাথর হয়ে মেঘটা পুবাকাশ অন্ধকার করে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। আমার হৃদপিন্ড এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। এতক্ষণ সীসার রঙের জল ছাড়া চোখের সামনে আর কিছু ছিল না। এখন দিগন্ত ঘেঁষে সমুদ্র গাঢ় নীল রঙ ধরেছে, মাঝের জলে সবুজের ছাপ, বর্ষার পরে নতুন ঘাস গজানো পলিমাটির যে-রং ধরে; আর একটু কাছের জল গৈরিক। উত্তাল অশান্ত ক্ষিপ্ত প্রখর। রূপার মুকুট পরে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে। একটা বড় ঢেউ বালির ওপর এতটা দুধ ছড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।'[২০] আবার কথকের দৃষ্টিতে ঢেউগুলি 'জুঁই ফুলের মতো সাদা' সেটাও প্রসঙ্গত লক্ষণীয়।

এই যে ছবি আমরা দেখলাম তা কথকের ভাবমূর্তি। তবে সমুদ্রের এই সৌন্দর্য শুধু যে সুন্দর তাও মনে হয় না, কিছুটা রহস্যময়তার আভাসও রয়েছে এই ভাবমূর্তির মধ্যে। কিন্তু কী সেই রহস্য? তা যেমন কথকের মনের জিজ্ঞাসা তারসঙ্গে গল্পপাঠকেরও। সেই রহস্য উন্মোচিত হয়েছে গল্পে মামা চরিত্রটির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যিনি সমুদ্রকে সবথেকে কাছ থেকে দেখেছেন। স্নানার্থীদের স্নান করার দৃশ্য বা সমুদ্র ঢেউয়ের সৌন্দর্য্য মামার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কেননা সমুদ্রের রং, রূপ, শব্দ, ঢেউ তার মনে যে ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে চায় তা সেই সব কিছুরই উর্ধ্বে। সমুদ্রকে সে কেবল সমুদ্ররূপে উপলব্ধি করেনি, উপলব্ধি করেছে এক হিংস্র জন্তু রূপে। যা ডাব, ফুল, বেলপাতা ইত্যাদি পছন্দ করে না, জন্তুদের মতো আমিষ পছন্দ করে। তাই সে কথককে বলে — 'পাথরের দেবতা না, মাটির ঠাকুর না- সমুদ্র হল সাংঘাতিক জীবন্ত একজন কেউ।... আমি যখনই বালুর চড়ে বেড়াতে আসি পকেটে করে কিছু মাছভাজা, কেক্ পাউরুটি বা আর-কিছু খাবার নিয়ে আসি।'[২১] তারপর বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সে বলে— '...আমার আপনার মতো তারও ক্ষুধা আছে, লোভ আছে, ইচ্ছা রুচি সব-কিছু। ওই দেখুন কেমন রাক্ষসের মতো হাঁ নিয়ে ছুটে ছুটে আসছে।'[২২] আবার যে ঢেউগুলি কথকের দৃষ্টিতে জুঁই ফুলের মতো সাদা মনে হয়েছে, সেই ঢেউগুলিকে দেখে মামা কথককে বলেছে— 'আপনি তখন বলেছিলেন জুঁইফুল-সাদা জুঁইয়ের মালা মাথায় জড়িয়ে ওরা আপনাকে আমাকে ভালোবাসতে আসে। তা তো বটেই-একটু ভাল করে নজর দিয়ে দেখুন, ফুল কি সাদা শক্ত ধারালো দাঁত ওগুলো।'[২৩] এভাবেই গল্পকার সমুদ্রকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং নিজের চিত্রভাবনাকে প্রস্ফুটিত করেছেন।

এখন আলোচনা করা যাক 'আলো-ছায়া'(Light and Shade) সম্পর্কে। আলো-ছায়া ছবির জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাঁরা ছবি আঁকেন বা ছবি বিষয়ে চর্চা করেন তাঁরা বোঝেন ছবি সৃষ্টি করতে হলে আলোছায়ার গুরুত্ব কতখানি। স্কেচ করার মধ্য দিয়ে তো একটি অবয়ব গড়ে তোলা হয়, কিন্তু তা বাস্তবানুগ(Realistic) হয়ে ওঠে কি? যদি একটি মানুষের অবয়বকে ফুটিয়ে তুলতে হয় তাহলে তার শরীরের বিভিন্ন গঠনকে প্রকাশ করতে ফোলা, ভাঁজ, গোল, চ্যাপ্টা এই বিভিন্ন জায়গাগুলি হুবহু ফুটিয়ে

তুলতে ব্যবহার করা হয় আলো ও ছায়া। প্রকৃতি জগতের কোনো কিছুকে চিত্ররূপ প্রদান করার জন্য; যেমন- ঘরবাড়ি, গাছপালা, নদীনালা সবক্ষেত্রেই আলো ছায়া প্রয়োজন হয়। যিনি আলো-ছায়ার যত ভালো ব্যবহার করেন তাঁর ছবি তত বেশি উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একসময় ছবি এঁকেছেন এবং পরে তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ছবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। কাজেই তিনি বোঝেন আলো-ছায়া ছবিকে কোন মাত্রায় পৌঁছে দিতে পারে। গল্পকার 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পটিতে আলো-ছায়ার নিপুণ ব্যবহার করেছেন। গল্পের কথক কুলদারঞ্জন পাইন পেশায় একজন সাধারণ কেরানি। অভাবের সংসারে স্ত্রী হেমলতা ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিল না। সে যে বাড়িতে বসবাস করে, তারই অন্য এক ঘরে নতুন ভাড়াটের আগমনে সে যেন নতুনত্ব অনুভব করে। তাদেরকে দেখার জন্য কুলদা বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে পড়ে ও জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য— 'জামা-কাপড় পরে ধনেচাল চিবোতে চিবোতে যখন বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, দেখি প্যাসেজের ওপাশের দরজা খুলেছে। এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো। এবং ঘুম যে ভেঙেছে চোখেই দেখতে পেলাম। শুকনো খোঁপার আধখানা মুখ থুবড়ে ঘাড়ের ওপর পড়েছে। ভাঙাচোরা আঁচলের ঢেউ। শরতের কাঁচা রোদ গালে কানে পিঠে লেগেছে। মেয়েটি-মেয়ে কি মহিলা তখনো ধরা গেল না-...'[২৪] বোঝা যায়, কথকের সঙ্গে লীলাময়ীর দূরত্ব খুব কাছাকাছি নয়, আবার খুব বেশি দূরও নয়। লক্ষ করতে হবে লেখক এখানে আলো হিসেবে ব্যবহার করেছেন 'শরতের কাঁচা রোদ' অর্থাৎ যা উজ্জ্বল ও ফটফটে। সেই আলো পড়েছে লীলাময়ীর 'গালে কানে পিঠে'। আমরা সাধারণত কারোর চেহারা দেখে তার বয়স অনুমান করতে পারি। যদি প্রশ্ন ওঠে কীভাবে? তাহলে স্মরণ করা দরকার একজন অল্পবয়সির চেহারায় যে ধরনের ভাঁজ পরিলক্ষিত হয় এবং একজন বয়স্কর চেহারা তার তুলনায় ভাঁজবহুল হয়। সেগুলি অতি সূক্ষ্ম হলেও চেহারার পেশি বলে দেয় তার সম্ভাব্য বয়স। উপরে উল্লেখিত গল্পাংশে কথক বলেছে — 'মেয়েটি মেয়ে কি মহিলা তখনো ধরা গেল না।' কারণ, কথক যেখান থেকে লীলাময়ীকে দেখছে এক ঝলকে চেহারার সূক্ষ্ম ভাঁজ সেখান থেকে অস্পষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক। আরও স্বাভাবিক শরতের কাঁচা রোদের কারণে। কেননা, মুখে বা পিঠে সোজাসুজি উজ্জ্বল আলো পড়লে সূক্ষ্ম ভাঁজগুলি আলোর উজ্জ্বলতার জন্য প্রকাশ পায় নি। তাই প্রথম দেখায় লীলাময়ীর বয়স অনুধাবন করতে সংশয়ে পড়তে হয়েছে কথককে। আবার যখন বিকেলে মাংস কিনে এনে দেওয়ার অনুরোধ করতে লীলাময়ী কথকের বাড়িতে উপস্থিত হয় তখন কথকের সে অসুবিধা হয় না। কাছ থেকে সেইটি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি বুঝতে পারেন 'মেয়েটি মেয়ে নয় মহিলা।'[২৬]

লীলাময়ীর যখন রান্না করার সময়, তখনও কথক তাকে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু লীলাময়ী দেওয়ালের আড়ালে থাকায় তাকে কল্পনায় দেখতে হয় কথককে। এখানে ছায়ার ব্যবহার লক্ষণীয়। আমরা দেখি সাধারণত কেউ উনুনের সামনে বসে রান্না করলে উনুনের আলো লেগে শরীরের ছায়াটি পিছনের দিকে গোল মতো দেখায়। গল্পের এই অংশেও তা পরিলক্ষিত হয়—'কেবল ওদিকের দেয়ালে একবার গোল-মতো একটা ছায়া দেখলাম। বুঝলাম দেয়ালে ঢাকা ওই অংশটায় বসে লীলাময়ী রাঁধছে। আর উল্টোদিকে ছায়া পড়েছে। একবার কাঁপছে আবার স্থির হয়ে আছে।'[২৭] এই অংশে তা আমরা লক্ষ করেছি। গল্পকার কথকের দৃষ্টিতে এই যে চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তা তাঁর এক অনবদ্য কৌশল। ছায়ার ব্যবহার করে দেওয়ালের আড়ালে লীলাময়ীর উপস্থিতিকে তিনি অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সাহিত্যে ছবির ব্যবহার অনিবার্য। প্রত্যেক সাহিত্যিকই তাঁদের সাহিত্যে ছবি ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছবিকে অন্য মাত্রা দিতে সক্ষম হয়েছেন, যা আমরা দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি। আলোচ্য গল্পগুলি থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে ছবি মানে শুধু সুন্দর প্রকৃতি বা সুন্দর কোনো জিনিসের বর্ণনা নয়, ছবি হল বাস্তবে যা কিছু অর্থবহ তাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা। 'নদী ও নারী', 'শ্বাপদ', 'পার্বতীপুরের বিকেল' ইত্যাদি গল্পে আমরা সুন্দর প্রকৃতির বর্ণনা পেয়েছি তবে এও দেখেছি সেগুলি কিভাবে আলাদা আলাদা অর্থবহন করছে। 'জ্বালা' গল্পে সানওয়ালার কুৎসিত চেহারার সুন্দর বর্ণনা আমরা পেয়েছি। 'গিরগিটি' গল্পে গল্পকার ভুবনের যে ছবি এঁকেছেন তাও লক্ষণীয়। এভাবেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লেখার দ্বারা তাঁর শিল্পীসত্তাকে বাস্তবায়িত করেছেন।

উল্লেখপঞ্জি:

১. নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, গল্পসমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩।
২. তদেব, পৃ. ৩।
৩. তদেব, পৃ. ৫, ৬।
৪. তদেব, পৃ. ৬১২।
৫. মুখোপাধ্যায় বিনোদবিহারী, চিত্রকথা, কাঞ্চন চক্রবর্তী সম্পাদিত, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৩০৩।
৬. নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, গল্পসমগ্র-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬১২।
৭. তদেব, পৃ. ৬১২।
৮. বসু নিতাই (সম্পাদিত), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ.-১৪৮।
৯. তদেব, পৃ. ৬১-৬৪। (৯.১- পৃ.৬১, ৯.২-পৃ.৬১, ৯.৩-পৃ. ৬১, ৯.৪-পৃ. ৬১, ৯.৫-পৃ. ৬২, ৯.৬-পৃ. ৬৪)।
১০. তদেব, পৃ. ৬৪।
১১. তদেব, পৃ. ৬৬।
১২. তদেব, পৃ. ৬৪।
১৩. তদেব।
১৪. তদেব, পৃ. ১৩৪।
১৫. তদেব, পৃ. ২৫১।
১৬. তদেব, পৃ. ২৫১।
১৭. তদেব, পৃ. ২৫১।
১৮. তদেব, পৃ. ১০৮।
১৯. তদেব, পৃ. ৪৪।
২০. তদেব।
২১. তদেব, পৃ. ৫৪।
২২. তদেব।
২৩. তদেব, পৃ. ৫৫।
২৪. তদেব, পৃ. ১৭৩।
২৫. তদেব, পৃ. ১৭৭।
২৬. তদেব।